International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-III, November 2019, Page No. 01-07
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i3.2019.1-7

শিল্পসৃষ্টিতে লে-আউট বা খসড়ার প্রাসঙ্গিকতা : রামকিঙ্কর বেইজ

বিশ্বজিৎ মিত্র
চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক, দৃশ্যকলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Art practice has been in vogue since time immemorial and the creation of a final and finished piece of art has evoked artist's praise and the spectators' wonders. The slow built up of the art work to such a perfection involves the artist's dedication, patience and enormous hard work which remains silent when the art work is finally completed.

The 'silence' of the artist's work is revealed through several sketches, termed as lay-out or 'khasra' indicating the drawings, line-sketches and planning of an art piece before its final execution. This planning gives way as to how an artist plans his creativity, changes and re-alters his own creation, visualizing the images, drawing them to give it a proper shape and keeping in mind the aesthetic sense of beauty.

The present paper hence deals with the relevance of lay-out or 'khasra' of the eminent artist Ramkinkar Baij of Bengal. His several paintings and sculptures bear testimony of the planning of his creation or 'khasra'. In this paper, some of his available 'khasras' has been discussed as to reveal the how the artist planned his creation, the repetitive changes made indicating the relevance of lay-out to make a note-worthy creation.

রামকিঙ্কর বেইজ (১৯০৬–১৯৮০) সম্পর্কে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু তাঁর অন্যতম শিষ্য বিনোদবিহারীকে মন্তব্য করেছিলেন, "রামকিঙ্কর মাটির কাজ করছে, তার হাতের কাজ দেখে বুক কেঁপে যায়। একি আর এক জন্মের সাধনায় হয়েছে। অনেক জন্মের সাধনা নিয়ে কিঙ্কর জন্মেছে।"[১] বাঁকুড়ার একটি সাধারণ গ্রামীণ পরিবারে জন্মগ্রহণ তাঁর এবং গ্রামীণ কর্মী মানুষের কর্মজীবনের ছন্দ, আনন্দ-উৎসবের ছন্দ, জাগতিক প্রতিবন্ধকতায় সে-ছন্দের পতন তাঁর শিল্পকর্মে আবেগ এনেছে। জীবনে আর প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠার আনন্দছন্দ, তাঁর পরিপন্থী দ্বন্দ্ব-ছন্দকে মানুষের জীবনের নানা ঘটনার মাধ্যমে চাক্ষুষ করে তোলাই যেন ছিল রামকিঙ্করের শিল্পীজীবনের লক্ষ্য। ভাস্কর্য এবং চিত্রকর্ম, উভয় ক্ষেত্রেই লোকজীবন তাঁর প্রেরণার উৎস হলেও লোকশিল্প কখনও তাঁর নিজস্ব শৈলীর উপাদান হয়নি।[২]

এরই পাশাপাশি তিনি ভাস্কর্য ও চিত্রশৈলীতে পশ্চিমি শিল্পকলার প্রভাবকে আত্মস্থ করেন। ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্য আর এক্সপ্রেশনিজম্ এর ভঙ্গিমাময় ভাষাভঙ্গিই ছিল তাঁর শৈলীর উৎসসূত্র।[৩] তিনি মনে করেছিলেন যে, ভারতীয় ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন এবং নতুন মাত্রা যোগ করা দরকার। মূর্তিকলায় তিনি বিষয় ও আঙ্গিক, দুদিক থেকেই পরম্পরা ভেঙেছিলেন। কোনো তথাকথিত আদর্শবাদ, রোমান্টিকতা কিংবা ব্যক্তিমহিমাদ্যোতকে অজুরার কাজ বর্জন

করে এমন সব মানুষ ও বিষয়কে গ্রহণ করেছিলেন যাদের এই সিল্প মাধ্যমে অঙ্গীভূত করার কথা কখনো কেউ ভাবেননি।[৪] মূর্তিকর হিসাবে সমধিক পরিচিত হলেও রামকিঙ্কর চিত্রকলা, মূর্তিকলা, ছাপছবি এবং মঞ্চসজ্জায় ও অভিনয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন।[৫] তাঁর উল্লেখযোগ্য চিত্রের চিত্র 'পিকনিক', 'গ্রামের মহিলা', 'গরু', 'মুরগি', 'শিলং সিরিজ', 'ফুলের জন্ম', 'নতুন শস্য', 'বিনোদিনী', 'মহিলা ও কুকুর', 'গ্রীষ্মকাল'।[৬] কৈশোরে চিত্রশিল্পী রামকিঙ্কর বেইজকে রাফায়েল ফ্লোরেনটাইন মাদোনা চিত্রমালাভুক্ত একটি ছবির অনুকৃতি করতে বলায় তার পরিবর্তে তিনি আঁকেন নির্বাসিতা সীতা।[৭] সংস্কারবদ্ধ সমাজে রামায়ণ মহাভারতের প্রভাব যেমন তাঁর উপর পড়েছিল সেই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার কারণে তৎকালীন অধিকাংশ হিন্দু যুবকের মতো অতীত গরীমাবোধের মানসিকতা থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন না। নব্য বঙ্গ ঘরানার অনুসরণে আঁকা এই ছবিতে ছিল পরিণত হাতের স্পর্শ।[৮] এছাড়াও শান্তিনিকেতনে যে সকল ভাস্কর্য তিনি তৈরী করেছিলেন সেগুলি কংক্রীট ঢালাই করে করা হয়েছে - মূর্তিগুলি আকারে খুবই বড়। ভাস্কর্যগুলি তাঁর মূল রচনারীতিতে নির্মিত হয়েছে। এই রচনার মধ্যে শিল্প দক্ষতা যতটুকু আছে তার চেয়ে বেশী আছে আত্মবিকাশের স্বতন্ত্র পথের সন্ধান ও স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা যা ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র কাম্য।[৯] রামকিঙ্কর বেইজ নির্মিত 'যক্ষ ও যক্ষী', শান্তিনিকেতনে 'সুজাতা', 'সাঁওতাল পরিবার', 'ফল সংগ্রহকারী', 'কলের বাঁশি', 'ধানঝাড়াই' উল্লেখযোগ্য। এ সৃষ্টিগুলিতে শিল্পকৃতির কথা বাদ দিলেও এমন একটি জিনিস পাওয়া যায় যাকে উপেক্ষা করা সহজ নয়। তা হচ্ছে গতি বা জীবন এবং সারল্য - যা তাঁর সৃষ্টিগুলিকে সজীব করে রেখেছে। ভাস্কর্য শিক্ষায় তিনি ফরাসী ভাস্কর বুর্দেল-র ছাত্রী[১০] লিজা ফনপট ও মার্গারেট মিলওয়ার্ড থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে বের্গম্যান শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। ভারতীয় ভাস্কর্যে রামকিঙ্করই প্রথম যিনি 'ওপেন-এয়ার' ভাস্কর্য করেছিলেন।[১১] নব্যবঙ্গীয় ধারায় রিয়েলিস্টিক কাজ করতে পছন্দ করতেন শিল্পী নন্দলাল বসু। অপরদিকে রামকিঙ্কর তার বিপরীতধর্মী কাজ করতেন।[১২] চিত্রকলার দিক থেকে অবনীন্দ্রনাথ এবং রামকিঙ্কর ছিলেন বেঙ্গল স্কুলের দুটি প্রান্ত বিন্দু। একজন বেঙ্গল স্কুলের সূচনা করেছিলেন, অপরজন বেঙ্গল স্কুলের অংশীদার হয়েও সেই রীতিকে ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁর ছবিতে দেখা গিয়েছিল নতুন আঙ্গিকের জ্যামিতিক বিন্যাস।

কিউবিজমকেও নিজের মতন করে ব্যবহার করেছেন সরাসরি নয় উপাদান হিসেবে। দুঃসাহসিক পরীক্ষা করেছেন আঙ্গিক ও উপকরণ নিয়ে।[১৩] চিত্রজগৎ এবং ভাস্কর্যে সমান পারদর্শীতা দেখিয়েছেন তিনি এবং এই সুদক্ষ, সুপরিকল্পিত চিত্ররচন এবং ভাস্কর্যের কিছু দৃষ্টান্ত মেলে তাঁর খসড়া বা লে-আউট ও মাকেটের মাধ্যমে। এইখানেই এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু খসড়ার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে কিছুমাত্রায় আলোকপাতের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথমেই যে প্রশ্নটি মাথায় আসে তা হল খসড়া কি? শিল্পীর সৃজনের নিরিখে দেখতে গেলে খসড়া হল মূল সৃজনের একটি বাহ্যিক চরিত্র যা অধিকাংশ সময়েই একটি রাফ স্কেচের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। আসলে শিল্পীর যে কল্পনা সেই কল্পনা বিভিন্ন গঠনমূলক উপাদান দিয়ে রূপদান করার জন্য তার একটা ইচ্ছে থাকে। এই রূপদানের ইচ্ছাই হল শিল্পীসত্তা। শিল্পীসত্তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা এই অবদমিত ইচ্ছার প্রাথমিক রূপদানটিই হল খসড়া।

এই পরিপ্রেক্ষিতে রামকিঙ্কর বেইজ'র 'বিনোদিনী' ছবিটির কথা ধরা যায়। মূল এই ছবিটি ১৯৪৮ সালে চটের কাপড়ের উপর তেল রং এ করা। বিনোদিনী ছবিটি করার জন্য তিনি সর্বমোট কয়টি লে-আউট করেছেন জানা যায় না। তবে বেশ কিছু লে-আউট আমাদের কাছে এসেছে। **খসড়া ১ :** লে-আউটটিতে বিনোদিনী দন্ডায়মান - এই লে-আউটে পরিস্কারভাবে অনুভব করা যাচ্ছে খোলা প্রান্তরে বিনোদিনী দাঁড়িয়ে এবং সেখানে বাতাস বইবার জন্য তার অঙ্গবস্ত্র দোলায়মান। এখানে বিনোদিনী অনেক বেশী মুক্ত ছন্দে দাঁড়িয়ে আছেন। কাঁধে একটি ভেনিটি ব্যাগ ও হাতে কিছু একটা আছে। ওই হাতের ওপর অন্য হাতটি রাখা আছে। ডানদিকে নিচে বাংলা হরফে তার স্বাক্ষর ও সাল লেখা আছে (১৫/২/৪৮)। মাধ্যম হিসাবে জলরঙ ব্যবহার করেছেন। তার সাথে কালো রেখার ব্যবহারে কাজটি সম্পন্য

করেছেন। **খসড়া ২ :** এই লে-আউটে বিনোদিনী শিল্পীর ইচ্ছেমতন বসেছেন, কিন্তু সেখানে জড়তা আছে। এখানেও জলরঙ ব্যবহার করেছেন। কালো রঙের আঁচড় নেই। ডানদিকে উপরে বাংলা হরফে তার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। **খসড়া ৩ :** এখানেও বিনোদিনী দন্ডায়মান। জলরঙ ও কাল রেখার গতীময়তা লক্ষণীয়। ডানদিকে নীচে বাংলাতে স্বাক্ষর (জড়িয়ে লিখেছেন), তারিখ ও মাসের উল্লেখ আছে (১৫/২)। অনুমান করা যায় খসড়া ১ ও ৩ এর বর্ণনা অনুযায়ী কাজটি একই দিনে করা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় হল এগুলি একটি মূল ছবির খসড়া হলেও এগুলির মধ্যে চিত্রকলার গুণাগুণ পরিপূর্ণ মাত্রায় খুঁজে পাওয়া যায় এবং জলরঙের চিত্রকলায় রামকিঙ্করের যে নিজস্ব ধারা সেই ধারাটি কিন্তু এই ছবিতে বর্তমান। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এগুলি স্কেচ হলেও চিত্রকলায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং একটি মূল ছবির লক্ষ্যে স্কেচগুলি তৈরী হলেও আজকের দিনে দাড়িয়ে শিল্প-ঐতিহাসিকরা এগুলিকে পরিপূর্ণ চিত্রকলা হিসাবে গণ্য করেন। এবার আসা যাক এই চিত্রগুলির সামগ্রিক গুণের কথায়, জলরঙে করা এই তিনটি চিত্র শৈলীগতভাবে বেঙ্গল স্কুলের আদর্শে রেখাঙ্কিত নয়। এগুলি গুণাগুণের দিক দিয়ে ভীষণ গতিময়, ছন্দযুক্ত এবং স্বচ্ছ। এখানে চিত্রকলার রঙ ও তুলির গুণাগুণ সম্পৃক্ত হয়ে আছে। এক কথায় পেইন্টারলি। **খসড়া ৪ :** এইখানে দুটি খসড়ার কথা একসাথে আলোচনা করবো। এগুলি দেখলে বোঝা যায় যে প্রত্যেকটি একটি মূল ছবি তৈরীর পরিকল্পনার চিত্রিত রূপ। খসড়া দুটোই পেনসিলে করা। একটির বাদিকে নীচে ইংরাজি হরফে RKK লেখা, অপরটিতে RK লেখা। ইংরাজিতে সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর করা। আর দুটোতেই নীচে ডানদিকে বিনোদিনী ইংরাজি হরফে লেখা দেখা যাচ্ছে। পূর্ববর্তী তিনটি খসড়া থেকে এই দুটি খসড়া একেবারেই স্বতন্ত্র, এই দুটি খসড়াতে পরিস্কার বোঝা যায় যে রামকিঙ্কর মূল ছবিতে স্ট্রাকচারের উপর জোর দিতে চেয়েছিলেন। এর রেখা অনেক বেশি কৌনিক ও দৃঢ়। এরূপরেখা অনেক বেশি সুচিন্তিতভাবে টানা এবং খসড়াটিতেই বোঝা গেছে যে রামকিঙ্কর ভাস্কর্যের আদলে বিনোদিনী চিত্রটি রচনা করতে চান। এর বিন্যাস জ্যামিতিক সমন্বয়ে তৈরী উপর এবং নীচে দুটি ত্রিভূজের সংযুক্তকরণেই এই ছবি। অর্থাৎ মূল ছবিতে যে গাঠনিক তাৎপর্যের উপরে ও জ্যামিতিক সামঞ্জস্যের উপরে ভাস্কর্যের মতোই জোড় দেওয়া হবে তা রামকিঙ্করের এই লে-আউটে / খসড়া দেখেই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু এই ক্ষেত্রে জ্যামিতিক বিন্যাস এর মতো ভাবলেও ভাস্কর্যে যা প্রযোজ্য চিত্রতে তিনি অন্য কিছু ভাবছেন তার প্রচেষ্টা করে চলেছেন। **খসড়া ৫ :** আরও দুটি বিনোদিনীর খসড়ার উল্লেখ করবো। প্রথমটিতে ড্রইংটি পুরো করেন নি। নীচের দিকটা ছেড়ে দিয়েছেন। ডান হাতের দিকে বাঁম হাত নিয়ে এসেছেন। ডান দিকে নিচে ইংরাজি হরফে তার স্বাক্ষর পাওয়া যাচ্ছে। মুখমন্ডল ও দৃষ্টি ডানদিকে হেলানো। এই ক্ষেত্রে হাতদুটি রাখার ভঙ্গিমার সাথে মূল কাজের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কাজটি কাগজের উপর কালি কলমে করা। অপরটিরও মুখমন্ডল ডানদিকে কাথ করা। আর অন্যমনস্ক ভাবে দুহাতে কিছু একটা ধরে বসে আছেন। ডানদিকে নীচে ইংরাজি হরফে তার স্বাক্ষর দেখা যাচ্ছে। **খসড়া ৬ :** এখানে মোড়ার উপর বসে আছেন। একদিকে গালে একহাত দিয়ে বসেছেন। মুখমন্ডল ও পায়ে চটি পরে আছেন পরিলক্ষিত হচ্ছে তার রেখার গভীরতা দেখে। অপরটিতে দুহাত জড়ো করে মুখমন্ডল ডানদিকে হেলিয়ে কেশবিন্যাসকে সামনের দিকে নিয়ে এসেছেন। প্রথম লে আউটের বাদিকে ও দ্বিতীয় লে-আউটের ডানদিকে নীচের দিকে তার পুরো নাম পদবি সমেত ইংরাজি হরফে স্বাক্ষর করেছেন।

সম্ভবতঃ এই স্কেচগুলিই নির্দেশ করে কিভাবে পারফেকশনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে খসড়া নির্মান করেছেন চিত্ররচনের প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে যাতে এই পারফেকশনের রিফলেকসন তার পূর্ণ চিত্রে পাওয়া যায়। লেআউট অনুসারে বিনোদিনীর মূল ছবি যা হওয়া উচিত ছিল তার প্রত্যেকটি পর্যায় তিনি চর্চা করে গেছেন। শুধু তাই নয়, তার পায়ের অবস্থান, বস্ত্র বিন্যাস মুখের অবয়ব পরিবর্তন অনেককিছু সংযোজন এবং বিয়োজন করে এগিয়ে গেছেন লক্ষ্যের দিকে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে চিত্রশিল্পী রামকিঙ্করের কাছে লে-আউট অপরিহার্য ছিল ঠিকই কিন্তু লে-আউটই তার কাছে সর্বশেষ সীমারেখা ছিল না। বিশেষভাবে পূর্ণাঙ্গ ছবিতে দেখা যাচ্ছে মাথার চুলে ফুঁল এঁকেছেন। সেক্ষেত্রে কোন খসড়াতে এই ফুলের নিদর্শন পাওয়া যায় না। বিনোদিনীর পেছনে কাঠের পাটাতন আংশিক ভাবে বাম ও ডান দিকে দেখা যাচ্ছে ও সামনের দিকে একটি টেবিলের ওপর সাদা কাগজের উপর রঙিন

কিছু একটা করা আছে। এগুলির কোনটাই খসড়াচিত্রে পরিলক্ষিত নয়। তিনি মূল ছবিতে সরাসরি উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে একাধিক লে-আউটের মাধ্যমে তিনি 'বিনোদিনী' ছবিটি তৈরীর ক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন। এইখান থেকে বোঝা যায় যে খসড়া শিল্পীকে তাঁর মনের মতো করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সহায়তা করে।

বিনোদিনীকে নিয়ে একই সময়ে অপর একটি কাজ করেছেন। প্রতিকৃতি চিত্র, কাগজের উপর জলরঙে করা। অতি দ্রুততার সঙ্গে জলরঙকে ব্যবহার করেছেন। তার সাথে যোগ করেছেন আলো ছায়ার বিন্যাস। রঙ লাগাবার কৌশল, অনুভূতি ও আবেগকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে প্রতিকৃতিটি রক্ত মাংসের এক বাস্তব সৃষ্টির আবেদনকে মূর্ত করেছে। রামকিঙ্কর খসড়াতে মুখাবয়টি বিভিন্ন মাধ্যমে অনুশীলন করে নিয়েছেন (কারণ এটি একটি নির্দিষ্ট রমনীর ছবি) যেমন পেনসিল, পেন এবং কালি, জলরঙে। সবই কাগজের উপর। মুখমন্ডলটি কখনও সোজা কখনও বা সামান্য বেঁকিয়ে এঁকেছেন। আলোছায়ার আভাস বোঝার জন্য কোন জায়গায় পেনসিল শেড করে আবার কোন জায়গায় কালি কলমের আঁচড় কেটে রেখেছেন। এই চর্চার প্রতিফলন সুপরিকল্পিত ভাবে তার মূল প্রতিকৃতিতে এসেছে। আবার একটি খসড়াতে মুখের কাছে হাত এনেছেন। পরে সেই অবস্থানকে বাদও দিয়েছেন অবলীলাক্রমে। বিভিন্ন ভাবে চর্চা করে দেখেছেন। যেটা মনে করেছেন, প্রয়োজনে নিয়েছেন। যা প্রয়োজন নয় তা তিনি বাদও দিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ চিত্রের সার্থক রূপায়নে। এই ভাবেই তিনি কাঙ্খিত পথের সন্ধানে নিমত্য হয়েছেন। প্রাথমিক ভাবনা অর্থাৎ খসড়াকে উপেক্ষা করেন নি। সংযোজন ও বিয়োজন ঘটিয়ে সার্থক সৃষ্টির দিক নির্ণয় করেছেন।

অপরদিকে তাঁর ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এক অনবদ্য সৃষ্টি যক্ষ-যক্ষীর পাথরের মূর্তি। যেটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়া, দিল্লীতে অবস্থিত। বিষয়গত ভাবনাতে ভারতীয় পৌরাণিক চরিত্রের অবতারণা করেছেন। যক্ষিণী হলেন পুরুষ যক্ষের মহিলা সহকর্মী। কোষাগার রক্ষাকারী হিসাবে চিহ্নিত। এই ভাবেই ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রাচীন পরম্পরাকে এক নতুন আঙ্গিকে রূপান্তর করলেন। এবার আসা যাক তার প্রস্তুতিপর্ব নিয়ে। যা তিনি করে রাখতেন কাগজ খাম মাকেটের মধ্যে দিয়ে। খসড়া যদি প্রাথমিক ভাবনার প্রতিফলন হয় তবে এই কথাটির সত্যতা প্রমাণ করবার একটা দায়িত্ব থেকে যায়। যে সময় ভাবনাটি তার মনে এসেছে তখন তাঁর পক্ষে রঙ-তুলি, কাগজ নিয়ে বসা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে তিনি কি করবেন ? মনের ভাবনাটি কি ব্যক্ত করবেন না? এখানেই লে-আউটের গুরুত্ব। সেইমত রামকিঙ্কর যখন যক্ষীর লে-আউট করছেন তখন তিনি একটি চিঠি ভরবার খামের পিছন দিকে আর একটি চিঠি ভরবার খামের সামনের দিকে করে রাখছেন। এর থেকেই বোঝা যায় তাৎক্ষণিক ইচ্ছার প্রতিফলন হল লে-আউট, যা চিত্রপট প্রমাণ করে দেয়। এখানেই লে-আউটের মজা। একটা অনবদ্য সৃষ্টির নেপথ্য কাহিনী হল লে-আউট। পৃথিবী ব্যাপী মানুষ যক্ষা-যক্ষীর মূর্তি দেখেছে। তাদের চোখের সামনে বিনোদিনীর ছবি বারে বারে প্রদর্শিত হয়েছে, কিন্তু সেই একটি ছবি বা মূর্তি রচনের পূর্বে শিল্পীর চিন্তা ভাবনার প্রতিটি স্তর কিরকম ভাবে স্রষ্টা পেরিয়ে এসেছেন তার খোঁজ কেউ রাখে না; নিস্তব্ধ সিঁড়ির মতো সে সকলের অজান্তেই শিল্পীর সর্বোচ্চ স্তরে পৌছবার প্রতিটি ধাপের সাক্ষী হয়ে থাকে। আর সেই লে-আউট থেকে আমরা বুঝতে পারি প্রথমে শিল্পী বিভিন্ন মুখি দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সৃজনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তারপর প্রত্যেকটি স্তর থেকে যা তার অপরিহার্য বলে মনে হয়েছে সেগুলি সংযুক্ত করে তিনি মূল চিত্ররচনাটিকে সাজিয়ে তুলেছেন।

এসবের পরিপ্রেক্ষিতে যক্ষীর লে-আউটের কথাটি বলা যায়। যক্ষীর ক্ষেত্রে বেশ কিছু লে-আউট পাওয়া গেছে। লে-আউটে দেখা যায় ভারতীয় ভাস্কর্যের প্রাচীন পরম্পরা। একটি আরেকটির পায়ের উপর দিয়ে গিয়ে বেদীতে দন্ডায়মান। এই ভঙ্গীর প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য থেকে শুরু করে নতুন গ্রামের কাঠের পুতুল পর্যন্ত সর্বত্র দেখা যায়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের খামের সামনে ড্রইং এর সাথে দেখা যাচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর ও বাংলাতে লিখে রাখছেন যক্ষিণী, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে। আর একটি কাগজে করা কালি কলমের খসড়াতে মূর্তিটির মাপ কত হবে ভাগে ভাগে তা উল্লেখ করেছেন সাথে তার সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর পরিলক্ষিত হচ্ছে ইংরাজি হরফে। আরও কিছু লে-আউট

পাওয়া যায় যাতে রেখার ব্যবহার জ্যামিতিক আকার নিয়েছে গঠনগত দিক থেকে৷ কিন্তু এটিকেই যখন প্লাস্টারে বদল / স্থানান্তকরণ করলেন তখন ডান হাত ও বাঁহাতের ভঙ্গিটিকে পরিবর্তন না করে পায়ের ভঙ্গিটিকে পাল্টে দিলেন পরম্পরা অনুসারে যা ছিল একটি ভঙ্গি দর্শনের রীতি, রামকিঙ্কর তাতে স্বাভাবিকতা যোগ করলেন, ফলে, যক্ষী ছন্দের দেবী না হয়ে অনেক স্বাভাবিকতা যোগ করলেন, ফলে, যক্ষী ছন্দের দেবী না হয়ে অনেক বেশি প্রত্নসঞ্জাত, আদিম হয়ে উঠল৷ কাগজের খসড়াতে মনে হচ্ছিল নৃত্যরতা, প্লাস্টারে তাকে মনে হচ্ছে পেশিবহুল, অনেক বেশি স্থুল ও আদিম৷

আরও দুটি খসড়া খামের সামনে ও পিছনে করা হয়েছে৷ সেই প্রসঙ্গে আসা যাক৷ খামের সামনে যেখানে লেখা আছে দ্যা ইন্ডিয়ান আকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, অমরিতসর তাতে যক্ষীর কোলে শিশু রয়েছে৷ অপর একটি খামের পেছনে করা শান্তিনিকেতন লেখা গোল স্ট্যাম্প লাগানো৷ এখানে ইংরাজী হরফে সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর করেছেন, যক্ষিণী কুবের লিখে কেটে দিয়ে বাংলা হরফে যক্ষী লিখেছেন৷ উপরের ড্রইংটি শিশু কোলে যক্ষী সামনের দিকে দাড়িয়ে আছে৷ নীচে বাদিকে অপেক্ষাকৃত ছোট্ট করে প্রোফাইলে গর্ভবতী নারী হিসাবে যক্ষীকে দেখিয়েছেন৷ আপাত দৃষ্টিতে দেখতে গেলে যক্ষীকে কখনও আদিমতার, মাতৃশক্তি ও উর্বরা শক্তির মধ্য দিয়ে দেখতে চেয়েছেন তার খসড়ার মধ্য দিয়ে৷

অপরদিকে যক্ষার খসড়ার দৃষ্টান্ত কালি কলমে কাগজ ও প্লাস্টার অফ্ প্যারিস এর মাকেটে পাওয়া যায়৷ সেখানেও স্বভাবসিদ্ধ সংযোজন ও বিয়োজন ঘটিয়ে মূল পর্বে পৌঁছতে চেয়েছেন শিল্পী৷ সামগ্রিকভাবে এই হল লে-আউটের বৈশিষ্ট্য৷

পরিবেশগত অপর একটি ভাস্কর্য হল 'কলের বাঁশি'৷ এই ভাস্কর্যটি তৈরির পেছনে যে প্রস্ততিপর্ব তা নিয়ে আলোকপাত করব৷ প্রসঙ্গত বলি রামকিঙ্কর তার ভাস্কর্য বা মূর্তি জনসমক্ষে ও উন্মুক্ত পরিবেশে স্থাপন করেছিলেন৷ 'কলের বাঁশি' ভাস্কর্যটি "বেদীর উপর তৈরি হলেও সেটি অপেক্ষাকৃত নিচু ছিল তাই মূর্তিটি সঠিকভাবে দেখার জন্য বেদী করা হয়েছে৷ বিষয়গত দিক থেকে দেখতে গেলে এক শ্রমজীবী পরিবারের মিলের সাইরেন শুনেই কাজের জন্য রওনা দেওয়ার একটি দৃশ্য উপস্থাপনা করেছেন৷ একাধিক অবয়বকে আন্তর্সম্পর্কে যুক্ত করা হয়েছে৷ উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন কাঁকড় বালি ও সিমেন্ট৷ আর্মেচার বা কাঠামোর দিকে এই মশালা ছুঁড়ে ছুঁড়ে লাগিয়ে প্রয়োজন অনুসারে ছুরি দিয়ে কেটে নিতেন৷"[১৪] এই পদ্ধতিতে কাজ করার ফলে মূর্তির উপর তৈরি হত একটা রাফ সারফেস৷ এই স্বকীয় ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতি আধুনিক ভারতের ভাস্কর্য হিসাবে এক অভিনবত্বের দাবী রাখে৷

এবার আসা যাক এই ভাস্কর্যটি অর্থাৎ "কলের বাঁশি" তৈরীর পরিকল্পনা পর্ব বা প্রস্তুতি পর্ব যা তিনি তার খসড়া চিত্রে করেছেন৷ খসড়া চিত্রটি কাগজের উপর কালি কলমে করা মাপ ৬ ইঞ্চি □ ৭.৭৫ ইঞ্চি৷ খসড়াটিতে একটি সংরচন দেখা যাচ্ছে, তাতে দুটি পূর্ণ বয়স্ক মহিলা ও একটি শিশুর রাফ স্কেচ উপলব্ধ হচ্ছে৷ অবয়বগুলি একটি বেদীর উপর দাড়িয়ে আছে৷ এই বেদীর একটি ইঙ্গিতপূর্ণ স্কেচ করা আছে, বাদিকে পূর্ণাঙ্গ ভাস্কর্য বা মূর্তিটির পরিমাপ কত হতে পারে তা নির্ণয় করার একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে৷ আর ডানদিকে নিচে রামকিঙ্কর বাংলা হরফে স্বাক্ষর পরিলক্ষিত হচ্ছে৷ মিলের সাইরেন শুনে ছুটছে এই গতিময়তা তার লে-আউটে পরিলক্ষিত হচ্ছে৷ এই ছোটার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বস্ত্র বাতাসে উড়ছে, তা তিনি রেখাতে খসড়ার মধ্যে দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন৷

পরিকল্পনা পর্বের খসড়াতে বিশেষ ভাবে নজর দিয়েছেন সংরচনকে কিভাবে সংগঠিত করা যায় অর্থাৎ তিনটি অবয়ব কে কি ভাবে একসাথে সংপৃক্ত রাখা যায়৷ প্রত্যেকটি অবয়ব একে অপরের পরিপূরক৷ কোন একটি কে বাদ দেওয়া প্রায় অসম্ভব৷ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত হয়ে তার নির্যাসটুকু নিয়ে তিনি সংরচনে যুক্ত করেছিলেন এক নতুন আঙ্গিকের জ্যামিতিক বিন্যাস৷ এই জ্যামিতিক বিন্যাস তার লে-আউট বা খসড়াতে পরিলক্ষিত হয় রেখার মধ্য দিয়ে৷ পরিকল্পনা ও তার প্রয়োগ এর মধ্যে লুকিয়ে আছে উপলব্ধি৷ এই উপলব্ধিকেই বিভিন্ন ভাবে দেখে

নেওয়ার একটা চর্চা যা খসড়াতে পরিলক্ষিত হয়। এখানে যা লক্ষ্যনীয় তা হল – **প্রথমতঃ** সংরচনের মধ্যে দিয়ে তিনটি অবয়বকে একসাথে তাদের নিজস্ব ছন্দে ও ভঙ্গিতে বেধে রাখার একটা প্রয়াস। যা রামকিঙ্কর তার পরিবেশ থেকে পেয়েছেন। আর অবয়বগুলি একটি বেদীর ওপর অবস্থান করবে তার, সূত্র নির্দেশ করা, যা তিনি স্কেচ করে দেখিয়েছেন। সম্পূর্ণ বিষয়টি তিনি দেখে নিতে চেয়েছেন তার খসড়ায়। **দ্বিতীয়তঃ** রেখা, যার আঁচড়ে গতিকে ও অবয়বের ভঙ্গিমাকে একসাথে পরিস্ফুট করে। আর সরল সাবলীল ভাবাদর্শের সঙ্গে রেখার জ্যমিতিক বিন্যাসের মধ্য দিয়ে অবয়বের গঠনকে আরও দৃঢ় ও ছন্দময় করে তুলেছে। **তৃতীয়তঃ** ভাস্কর্য বা মূর্তিকলা তৈরীর কর্মপদ্ধতি তিনি নিজে নিজের মতো করে তৈরি করেছিলেন। সেখানে তিনি বেশি জোর দিয়েছিলেন তার নিজের বোধ ও আবেগকে। তা সত্ত্বেও বলি, তিনি অঙ্কটা ভোলেননি। তার ভাস্কর্যটি কত মাপের হবে তা তিনি খসড়া বা লে-আউটে উল্লেখ করে রেখেছেন। সঠিক ভাবে রূপায়নের ক্ষেত্রে তিনি কতটা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন তা তার পরিকল্পনা পর্যায়ের চিত্রিত রূপ লে-আউট বা খসড়াতে উপলব্ধি করা যায়।

পূর্ণাঙ্গ ভাস্কর্যটি যখন করলেন তখন কিন্তু খসড়া বা লে-আউটের সম্পূর্ণ অনুকরণ করেন নি। মূল বিষয়টি করে তার মধ্যে অদল বদল করেছেন। লে-আউটে বেদিটি সমতল দেখানো ছিল। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ভাস্কর্যে বেদী হিসাবে দেখালেও তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বীরভূমের ধূসর এবড়ো খেবড়ো ভূমি, যার মধ্যে দিয়ে তাঁরা ছুটে চলেছে। সামনে অবয়বটির হাত, পা ও মুখের দিক পরিবর্তন করেছেন মূল কাজে। মাথায় কলসি / হাঁড়ির ইঙ্গিতপূর্ণ অবস্থানও বদলে দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ মাথায় বসিয়েছেন। আবার দ্বিতীয় মহিলার মুখেরদিক বদলে দিয়েছেন। মাথার কেশ বিন্যাস ঘটিয়ে বস্ত্রের সাথে যোগ করিয়ে একদা বহমনাতা এনেছেন। যা এককথায় দৃষ্টান্ত মূলক। অপরদিকে শিশুটিকেও সংরচনের খাতিরে মূল অবয়বের আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন। আরও সংপৃক্ত করেছেন। বিশেষ করে তিনি যে মাধ্যমে কাজ করতেন তার কথা ভেবেই। সংযোজন বিয়োজন ও সংহতি গুণ বজায় রেখে তার স্বস্ফূর্ত আবেদনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। শিল্পীর অবদমিত উপলব্ধির প্রচেষ্টা যার কিছুটা আভাস লে-আউট বা খসড়ার মধ্যে দেখা যায়। সেই খসড়াও পরিবর্তন হতে পারে। আবার পূর্ণাঙ্গ কাজেও সংযোজন বিয়জন হতে থাকে। আসল কথাটি হল উপলব্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছানো।

উল্লেখযোগ্য আর একটি ভাস্কর্য বা মূর্তিকলা হল “ফল সংগ্রহকারী”। যার খসড়া বা লে-আউট দেখা যায়। কালি কলমে করা (৪.৭৫″□□৬.২৫″) স্বভাবসিদ্ধ জ্যামিতিক বিন্যাসের সুগঠিত সংরচনে দুটি দন্ডায়মান মহিলার সাবলীল লাইন স্কেচ উপস্থাপনা করেছেন। মহিলাদের হাটু দুটি ভাঁজ করা ও পায়ের তলায় ফলের ঝুড়ি, তাতে ফল সংগ্রহ করে রাখা আছে। তারা নিজেরা নিজেদেরকে হাত দিয়ে মুখের দিকে ফল এগিয়ে দিচ্ছে। দুজনে একটি বেদীর উপর দাড়িয়ে আছেন তার স্কেচ দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে নিচে বাংলা হরফে তার স্বাক্ষর বর্তমান। স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীন লাইন, হাঁটু ভাঁজ করে রাখা ও তার নীচে ফলের ঝুড়ির উপস্থাপনা সামগ্রিক ভাবে একটি ত্রিভূজের রূপ নিয়েছে। সবদিক থেকে বিষয়কে এক ছন্দের মধ্যে দিয়ে সংপৃক্ত করেছেন।

মূল ভাস্কর্যে খসড়ার আবেদন টুকু নিয়েছেন খুব সতর্কভাবে। দুজনে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন (বেদীটির উপর)। মুখমন্ডলে এক আনন্দময় প্রশান্তির ছাপ। কিউবিস্ট ফর্ম কে সচেতন ভাবে তার ভাস্কর্যে কাছে লাগিয়েছেন। খসড়াতে মহিলারা দন্ডায়মান কিন্তু মূল ভাস্কর্যে তাদেরকে হাঁটু মুড়ে বসিয়েছেন তা দেখা যাচ্ছে। এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে খসড়া হচ্ছে তার তাৎক্ষণিক প্রতিফলন, এই প্রতিফলনকে সামনে রেখে তিনি মূল কাজে তার চিন্তাভাবনাকে আরও সংগঠিত করেছেন। মূলকাজ রূপায়ণে খসড়ার যে ভূমিকা ও গুরুত্ব আছে। তা তার প্রস্তুতি পর্বে খসড়া চিত্রের মধ্যে দিয়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে। একটি সৃষ্টির মধ্যে যে পরিকল্পনা পর্ব যা খসড়াতে দেখা যাচ্ছে, এই পর্যায়টিকে অনুসন্ধান করলে তার সৃষ্টির পর্যায়ক্রমকে ও শিল্পীর মানসিক প্রতিচ্ছবিকে উপলব্ধি করা সম্ভব।

এখান থেকে প্রমাণ হয় যে লে-আউট শিল্প সৃজনের একটি অঙ্গ, সে মূল সৃজন থেকে কখনই আলাদা নয় এবং কোন লে-আউটকে মূল সজৃনটি থেকে পৃথকভাবে দেখা উচিত নয়। কিন্তু মূল কাজের পাশে লে-আউট রাখবার

দরকার হয় না। যেমন স্থাপত্যের গ্রাউন্ড প্ল্যানের উপর স্থাপত্য গড়ে ওঠে কিন্তু মূল স্থাপত্যটি দেখবার সময় তার গ্রাউন্ড প্ল্যান আমরা দেখতে পাই না; কিন্তু একটি উপযুক্ত গ্রাউন্ড প্ল্যানের ফলে স্থাপত্যের অভ্যন্তরে তৈরী হওয়া গুণাগুণকেই ব্যবহার বা উপভোগ করে থাকি ঠিক সেই রকমই এক বা একাধিক লে-আউট / খসড়া শিল্পীকে তাঁর শিল্প সৃজনকে যে স্তরে উত্তীর্ণ করে সেখানেই খসড়ার প্রাসঙ্গিকতা।

খসড়া একটি ব্যক্তিগত শৈল্পিক প্রচেষ্টা, পূর্ণাঙ্গ চিত্রকলা তৈরীর এক অসামান্য পরিকল্পনার পর্যায়, যেখানে শিল্পী শুধুমাত্র রৈখিক ছন্দে ও বুনটেই পরিমাপ, রঙ ও রূপের বৈচিত্রকে কল্পনা করে নিতে পারেন এবং খসড়া হল ক্রমান্বয়ে মূল সৃষ্টির কাছে পৌঁছবার একটি প্রশস্ত রাস্তা। তাৎক্ষণিক ইচ্ছা, অভিব্যক্তি, চেতনা সবকিছু নিয়েই খসড়া। সর্বপরি রামকিঙ্করের মূল শিল্পকর্ম ও খসড়াকে আলাদা করা যায় না। দুটো ক্ষেত্রেই তার সবলীল বিচরণ।

তথ্যসূত্র:

১। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় : 'সাধকশিল্পী রামকিঙ্কর', Visva-Bharati News, Sept., Oct., 1980, p. 87
২। প্রণবরঞ্জন রায় : 'কলামনস্তিতার একশো বছর', দেশ, মার্চ, ৪, ২০০০, পৃ. ২২
৩। তদেব, পৃ. ২২, ৩২
৪। শোভন সোম : 'তিন শিল্পী', কোলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১৫৮
৫। তদেব, পৃ. ১৪২
৬। কৃষ্ণলাল দাস : 'শিল্প ও শিল্পী', দ্বিতীয় খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ ৪১০
৭। 'নির্বাসিতা', ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩৩২।
৮। শোভন সোম : 'তিন শিল্পী', কোলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১৪৩
৯। কৃষ্ণলাল দাস : 'শিল্প ও শিল্পী', দ্বিতীয় খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ ৪১০
১০। তদেব, পৃ. ৪১০
১১। গৌতম দাস : 'বাংলায় শিল্পচর্চার উত্তরাধিকার', কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৬৭
১২। তদেব, পৃ. ১৬৭
১৩। সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'কলাভবনের যুগ্ম নক্ষত্র : বিনোদবিহারী রামকিঙ্কর', চারুকলা, রাজ্য চারুকলা পর্ষদ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৯২
১৪। শোভন সোম : 'তিন শিল্পী', কোলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১৫৯